সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

হেদায়াত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

SH

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৫২

২৬তম প্রকাশ

শাবান	১৪২৯
ভাদ্র	১৪১৫
সেপ্টেম্বর	২০০৮

বিনিময় : ১৭.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

هدايات -এর বাংলা অনুবাদ

HEDAYET by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 17.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সহকর্মী বন্ধুগণ !

চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের পর এখন সকলেই এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। এ সম্মেলন উপলক্ষে নির্ধারিত কার্যসূচী আল্লাহর ফযলে সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই সম্পর্কে আমরা বিশেষ অধিবেশনে মোটামুটিভাবে পর্যালোচনাও করেছি। এখান থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি আমার সহকর্মী—রুকন এবং মুত্তাফিকগণকে (বর্তমানে সহযোগী সদস্য) আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা বলতে চাই ; যেন তারা ভবিষ্যতে নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক

আম্বিয়ামে কিরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং জাতির আদর্শ ও সৎ ব্যক্তিগণ প্রত্যেকটি কাজ উপলক্ষে তাদের সহকর্মীগণকে যে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, সর্বপ্রথম আমি তার উল্লেখ করতে চাই। তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে, মনে-প্রাণে তাঁর প্রতি ভক্তিভাব পোষণ করতে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে তাকীদ করেছেন। তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে আমিও আপনাদেরকে আজ এ উপদেশই দিচ্ছি। আর ভবিষ্যতেও আমি যখন সুযোগ পাবো, ইনশাআল্লাহ একথাই আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবো। কারণ এ বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যান্য সকল বিষয়ের তুলনায় এটাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি ঈমান, ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর সাথে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপন, নৈতিক চরিত্রে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ এবং আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের বেলায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভ করাকেই প্রাধান্য দেয়া দরকার। মোটকথা আমাদের সমগ্র জীবনের সংস্কার-সংশোধন এবং উন্নতির জন্য যাবতীয় চেষ্টা-তৎপরতার মূলে অন্যান্য উদ্দেশ্যের তুলনায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের আগ্রহেরই প্রাধান্য লাভ করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত আমরা যে কাজের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছি, এটা শুধু আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে পারে। আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে

১৯৫১ সালের ১৩ নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা।

যতখানি গভীর ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করবো আমাদের আন্দোলন ততোই মযবুত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক দুর্বল হলে এ আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ যেন এটা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

বলা বাহুল্য মানুষ যে কাজেই অংশগ্রহণ করুক না কেন—সেই কাজ দুনিয়ার হোক কি আখেরাতের—তার প্রেরণা সেই কাজের মূল উদ্দেশ্য হতেই লাভ করে। যে কাজের জন্য সে উদ্যোগ-আয়োজন করেছে, সেই কাজে তার চেষ্টা-তৎপরতা তখনই পরিলক্ষিত হবে যখন মূল উদ্দেশ্যের সাথে তার মনে প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেবে। আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রবৃত্তির পূজা করতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি যতবেশী স্বার্থপর হবে, ততোই সে আপন প্রবৃত্তির জন্য কাজ করতে থাকবে। সন্তান-সন্ততির মঙ্গল সাধনের জন্য যে ব্যক্তি কাজ করে, মূলত সে-ও সন্তান বাৎসল্যের আধিক্যে উন্মাদে পরিণত হয়। আর ঠিক তখনি সেই ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য নিজের পার্থিব জীবনেই নয় নিজের আখেরাতকেও বরবাদ করতে ইতস্তত করে না। কারণ তার সন্তান-সন্ততি অধিকতর সুখ-শান্তি লাভ করুক এটাই হচ্ছে তার একমাত্র কামনা।

অনুরূপভাবে দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তি মূলত দেশ ও জাতির প্রেমে আবদ্ধ হয়। এর ফলেই সেই ব্যক্তি দেশ ও জাতির আযাদী, নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে, কয়েদখানার দুর্বিসহ যাতনা অনায়াসে বরণ করে এবং এজন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। এমনকি এ কাজে সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং আমরা যদি এ কাজ আপন প্রবৃত্তির জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, দেশ ও জাতির বিশেষ কোনো স্বার্থের জন্য না-ই করি বরং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই কাজ মনে করে এ পথে অগ্রসর হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর এবং মযবুত না হলে যে আমাদের এ কাজ কখনো অগ্রসর হতে পারে না, একথা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। আর এ কাজের জন্য আমাদের চেষ্টা-তৎপরতা শুধু তখনই শুরু হতে পারে যখন আমাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আল্লাহর বাণীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই কেন্দ্রীভূত হবে। এ কাজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার সাথে শুধু সম্পর্ক স্থাপন করাই যথেষ্ট নয় বরং তাদের যাবতীয় আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সাথেই সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। এটা একাধিক সম্পর্কের

একটি অন্যতম সম্পর্ক হলে চলবে না, বরং এটাকেই একমাত্র মৌলিক ও বাস্তব যোগসূত্রে পরিণত হতে হবে। পরন্তু আল্লাহ তাআলার সাথে এ সংযোগ-সম্পর্ক হ্রাস না পেয়ে বরং যাতে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় সেই চিন্তাই যেন তাদের মনে প্রতিটি মুহূর্তে জাগরুক থাকে। বস্তুত আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই যে আমাদের এ কাজের মূল প্রাণ স্বরূপ ; এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিমত নেই। আল্লাহর ফযলে আমাদের কোনো সহকর্মীই এর গুরুত্ব সম্পর্কে অসতর্ক নয়। তবে এ ব্যাপারে কতকগুলো প্রশ্ন অনেক সময় লোকদেরকে বিব্রত করে তোলে, তাই এই যে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সঠিক তাৎপর্য কি, এটা কিরূপে স্থাপিত এবং বর্ধিত হয়। আর আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, থাকলেই বা কতখানি এবং এসব কথা জানাবার সঠিক উপায় কি হতে পারে ?

এ সকল প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর জানা না থাকার কারণে আমি অনেক সময় অনুভব করেছি যে, অনেকেই এ ব্যাপারে নিজেদেরকে সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে পতিত ও সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় দেখতে পায়। সেখানে বসে তারা আপন লক্ষ্য পথের সন্ধান করতে পারে না, এমনকি কতখানি পথ অতিক্রম করেছে, কোন্খানে এসে পৌঁছেছে এবং কতখানি পথ বাকি আছে, তাও সঠিকরূপে অনুমান করতে পারে না। ফলে অনেক সময় আমাদের কোনো সহকর্মী হয়তো অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েন। কেউ বা এমন পথে অগ্রসর হতে থাকেন, যে পথে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আবার কারো পক্ষে লক্ষ্যস্থলের দূরে কিংবা নিকটবর্তী বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কেউ বা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এ কারণেই আমি আপনাদেরকে শুধু আল্লাহ তাআলার সাথে সংযোগ স্থাপন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হবো না, বরং উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর একটা সুষ্ঠু জবাব দেয়ার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবো।

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের তাৎপর্য সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ মানুষের জীবন-মরণ, ইবাদাত-বন্দেগী, কুরবানী ইত্যাদি সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারিত হবে। এজন্যই নির্দিষ্ট করে তাঁর ইবাদাত করবে ঃ

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্যই উৎসর্গীকৃত।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৬২

وَمَآ اُمِرُوْآ اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ - البينة : ٥

"সে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট করে তার ইবাদাত করবে।"

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিকবার এ সম্পর্ক সম্বন্ধে এমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন যে, এর অর্থ ও তাৎপর্যের ভিতর কোনোটাই অস্পষ্টতা নেই।

তাঁর বাণীসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ হচ্ছে ঃ

خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَّةِ -

"গোপনে এবং প্রকাশ্যে সকল কাজেই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা।"

اَنْ تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَى اللّٰهِ اَوْثَقَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ

নিজের উপায়-উপাদানের তুলনায় আল্লাহ তাআলার মহান শক্তির উপরেই অধিক ভরসা করা এবং مَنِ الْتَمَسَ رَضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকের বিরাগভাজন হওয়া। এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হচ্ছে লোকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য আল্লাহ তাআলার অসন্তোষ অর্জন করা مَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ অতপর এ সংযোগ-সম্পর্ক যখন বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে, লোকের সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুতা এবং লেন-দেন ইত্যাদি সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হবে, নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তি বা আগ্রহ ঘৃণার বিন্দুমাত্র প্রভাবও সেখানে থাকবে না, তখনই বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে তার সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয়েছে।

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

এছাড়া প্রত্যেক রাতে আপনারা দোয়ায়ে কুনুতে যা পাঠ করেন, তার প্রতিটি শব্দই আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার এ সম্পর্কের পরিচয় দিচ্ছে। আপনারা আল্লাহ তাআলার সাথে কোন্ ধরনের যোগ-সম্পর্ক স্থাপনের স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তা এ দোয়ার শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলেই সুন্দররূপে বুঝতে পারবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ـ وَنَشْكُرُوْكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

"হে আল্লাহ ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাচ্ছি, তোমারই কাছে সরল-সত্য পথের নির্দেশ চাচ্ছি, তোমারই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, তোমারই উপরে আস্থা স্থাপন করছি, তোমারই উপরে ভরসা করছি এবং তোমার যাবতীয় উত্তম প্রশংসা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করছি। আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, তোমার অকৃতজ্ঞ দলে শামিল নই। তোমার অবাধ্য ব্যক্তিকে আমরা বর্জন করে চলি। হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, তোমারই জন্য সালাত আদায় করি, সেজদা করি এবং তোমার জন্যই আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-তৎপরতা নিবদ্ধ। আমরা তোমার অনুগ্রহ প্রার্থী এবং তোমার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয়ই তোমার যাবতীয় আযাব কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট।"

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য উঠার সময় যে দোয়া পাঠ করতেন তাতেও আল্লাহ তাআলার সাথে এ সম্পর্কের একটি চিত্র পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহ তাআলাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ

"হে আল্লাহ ! আমি তোমারই অনুগত হলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমার উপর ভরসা করলাম, তোমার দিকে আমি নিবিষ্ট হলাম, তোমার জন্যই আমি লড়াই করছি এবং তোমার দরবারেই আমি ফরিয়াদ জানাচ্ছি।"

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়

আল্লাহ তাআলার সাথে একজন মু'মিনের যে সম্পর্ক থাকা উচিত, উপরে তার সঠিক বর্ণনা দেয়া হলো। এখন এ সম্পর্ক এবং তা বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে তা-ই আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে।

এ সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাত্র উপায় রয়েছে, তা এই যে, মানুষকে সর্বান্তকরণে এক ও লা-শরীক আল্লাহ তাআলাকে নিজের এবং সমগ্র জগতের একমাত্র মালিক, উপাস্য এবং শাসকরূপে স্বীকার করতে হবে। প্রভুত্বের যাবতীয় গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের মন-মস্তিষ্ককে শিরকের যাবতীয় কলুষ-কালিমা হতে মুক্ত করতে এবং নিজের অন্তরকে নির্মল ও পবিত্র রাখতে হবে। এ কাজটি সম্পাদনের পরই আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্ক দুটি উপায়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রথমটি হলো চিন্তা ও গবেষণার পন্থা আর দ্বিতীয়টি হলো বাস্তব কাজের পন্থা।

চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় হলো পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের সাহায্যে এ ধরনের সংযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা। এভাবে আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার যে স্বাভাবিক সম্পর্ক রয়েছে কার্যত যেরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত সেই বিষয়ে আপনাকে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। এ ধরনের যোগসূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও অনুভূতি লাভ এবং এটাকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস বুঝে পাঠ করতে হবে এবং বারবার অধ্যয়ন করতে হবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে যে সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার যোগ সম্পর্ক অনুভূত হবে সেইসব বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে ; নিজের অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাথে আপনি কোন্ বিষয়ে কতখানি যোগ সম্পর্ক কার্যত স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে কতখানি দাবী আপনি পূরণ করেছেন, কোন্ বিষয়ে কতখানি ত্রুটি অনুভব করেছেন, আপনাকে তা যাচাই করে দেখতে হবে। এ অনুভূতি সমীক্ষা যতখানি বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে আল্লাহ তাআলার যোগ সম্পর্কও ততই বাড়তে থাকবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার একটি সম্পর্ক এই যে, তিনি আপনাদের মাবুদ এবং আপনারা তাঁর গোলাম। দ্বিতীয় সম্পর্ক হলো, পৃথিবীর বুকে আপনারা তাঁর প্রতিনিধি। আর তিনি অসংখ্য জিনিস আপনাদের কাছে আমানত রেখেছেন। তৃতীয় সম্পর্ক এই যে, আপনারা তাঁর প্রতি ঈমান এনে একটি বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করেছেন। সেই অনুসারে আপনাদের জান ও মাল তাঁকে প্রদান করেছেন। এবং তিনি জান্নাতের বিনিময়ে তা খরিদ করে নিয়েছেন। চতুর্থ সম্পর্ক এই

যে, আপনাকে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং তিনি শুধু আপনার প্রকাশ্য বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই হিসেব গ্রহণ করবেন না। বরং আপনার প্রত্যেকটি কাজ, আপনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে ; তার দৃষ্টিতে তিনি আপনার পুংখানুপুংখ হিসেব গ্রহণ করবেন। মোটকথা, এরূপ আরো অনেক বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাথে আপনার সম্পর্ক রয়েছে। এই সকল সংযোগ-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা, এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা ও এর সদাসর্বদা স্মরণ রাখা এবং এর দাবীগুলো পূরণ করার উপরই আল্লাহ্ তাআলার সাথে আপনাদের সম্পর্ক-সংযোগ গভীর ও ঘনিষ্ঠতর হওয়া নির্ভর করছে। এ ব্যাপারে আপনারা যতখানি শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ্ তাআলার সাথে আপনাদের সংযোগ ততই দুর্বল হতে থাকবে। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে আপনারা যতখানি সতর্ক ও মনোযোগী হবেন, ততই আল্লাহ্ তাআলার সাথে আপনাদের সম্পর্ক গভীর ও মযবুত হবে। কিন্তু বাস্তব কাজের দ্বারা শক্তি ও সাহায্য লাভ না হলে এ মানসিক প্রক্রিয়া কিছুতেই সফল হতে পারে না। বরং এরূপ নিক্রীয় মনোভাব নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়াই সম্ভব নয়। বাস্তব কাজ বলতে বুঝায় নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করা এবং তাঁর তুষ্টি বিধানের জন্য অনুরূপ প্রত্যেকটি কাজে প্রাণপাত পরিশ্রম করা। আর নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য বলতে বুঝায়, কেবল অনিচ্ছায় নয়, বরং স্বতস্ফূর্ত আগ্রহ-উৎসাহের সাথে গোপনে এবং প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার যাবতীয় নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করা। এ সমস্ত কাজে কোনো পার্থিব স্বার্থ নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিলাভ করাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা যে সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, গোপনে ও প্রকাশ্যে যে কোনো অবস্থায় তা আন্তরিক ঘৃণার সাথে বর্জন করতে হবে। এবং এর মূলেও কোনো প্রকার পার্থিব ক্ষতি বা বিপদের আশংকা নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলার গযব বা শাস্তির ভয়কেই বিশেষভাবে সক্রিয় রাখতে হবে। এভাবে আপনার যাবতীয় কার্যকলাপ 'তাকওয়ার' পর্যায়ে উপনীত হবে এবং এর পরবর্তী কর্মপন্থা আপনাকে 'ইহ্সানে'র স্তরে উন্নীত করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার পসন্দ অনুসারে প্রত্যেকটি ন্যায় ও সৎকাজের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আপনি আগ্রহের সাথে আত্মনিয়োগ করবেন এবং তার অপসন্দনীয় প্রত্যেকটি অন্যায় ও অসৎকাজের প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্রত হবেন। এ পথে আপনি নিজের জান-মাল, শ্রম এবং মন-মগযের শক্তি সামর্থ কুরবানী করার ব্যাপারে কোনো প্রকার কার্পণ্য করবেন না।

শুধু তাই নয়, এ পথে আপনি যা কিছু কুরবানী করবেন সেই জন্য আপনার মনে বিন্দুমাত্র গর্ব অনুভূত হওয়া উচিত নয়। আপনি কারো প্রতি কিছুমাত্র 'অনুগ্রহ' করেছেন—এরূপ ধারণাও কখনো পোষণ করবেন না। বরং বৃহত্তর কুরবানীর পরও যেন আপনার মনে একথাই জাগ্রত থাকে যে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আপনার যে দায়িত্ব রয়েছে, এতসব করার পরও তা পালন করা সম্ভব হয়নি।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিকাশ সাধনের উপকরণ

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কর্মপন্থা অনুসরণ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। এটা অত্যন্ত দুর্গম লক্ষ্যস্থল, এ পর্যন্ত পৌছতে হলে বিশেষ শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে এ শক্তি অর্জন করা সম্ভব।

এক ঃ সালাত—শুধু ফরয এবং সুন্নাতই নয় ; বরং সাধ্যানুযায়ী নফল সালাতও আদায় করা দরকার। কিন্তু নফল সালাত অত্যন্ত গোপনে আদায় করতে হবে, যেন আল্লাহ তাআলার সাথে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং আপনার মধ্যে নিষ্ঠার ভাব জাগ্রত হয়। নফল পড়া বিশেষত তাহাজ্জুদ পড়ার কথা যাহির করতে থাকলে মানুষের মধ্যে এক প্রকার মারাত্মক 'রিয়া' ও অহমিকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মুমিন ব্যক্তির পক্ষে এটা বড়ই মারাত্মক। অন্যান্য নফল সাদকা এবং যিকর-আযকারের প্রচারের মধ্যেও অনুরূপ ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

দুই ঃ আল্লাহর যিক্র—জীবনের সকল অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার যিক্র করা উচিত। কিন্তু বিভিন্ন সুফী সম্প্রদায় এজন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন কিংবা অপরের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। বরং এ সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পন্থা অনুসরণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন তা-ই হচ্ছে উত্তম ও সঠিক প্রক্রিয়া। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত দোয়া, যিক্র ইত্যাদির মধ্যে যতখানি সম্ভব আপনারা মুখস্ত করে নিবেন এবং শব্দ ও তার অর্থ উত্তমরূপে বুঝে নিবেন ; অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা মাঝে মাঝে পড়তে থাকবেন। বস্তুত আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ রাখা এবং তাঁর প্রতি মনকে নিবিষ্ট রাখার জন্য এটা একটি বিশেষ কার্যকরী পন্থা।

তিন ঃ সওম—শুধু ফরয নয় ; বরং নফল সওমও প্রয়োজন। প্রত্যেক মাসে নিয়মিত তিনটি সওম রাখাই উত্তম। নফল সম্পর্কে এটাই বিশেষ উপযোগী ব্যবস্থা। এ সময়ে সওমের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কুরআন শরীফে বর্ণিত 'তাকওয়া' অর্জনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

চার ঃ আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করা—এ ব্যাপারে শুধু ফরযই নয় ; সাধ্যানুসারে নফলও আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে একটি কথা উত্তমরূপে বুঝে নেয়া দরকার যে, আপনি আল্লাহ তাআলার পথে কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছেন, মূলত তার কোনো গুরুত্ব নেই ; বরং আপনি আল্লাহর জন্য কতখানি কুরবানী করলেন তা-ই হচ্ছে প্রকৃত বিচার্য। একজন গরীব যদি অভুক্ত থেকে আল্লাহর রাস্তায় একটি পয়সাও ব্যয় করে তবে তার সেই পয়সাটি ধনী ব্যক্তির এক হাজার টাকা হতে উত্তম। ধনী ব্যক্তির এক হাজার টাকা হয়তো তার ভোগ সামগ্রীর দশমাংশ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এ প্রসংগে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার, আত্মার বিশুদ্ধিকরণের (তাযকিয়ায়ে নাফস) জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব পন্থা নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে সাদকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর কার্যকরী ক্ষমতা সম্পর্কে আপনি অনুশীলন করে দেখতে পারেন কোনো ব্যাপারে আপনার একমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে আপনি অনুতপ্ত হৃদয়ে শুধু তাওবা করেই ক্ষান্ত হবেন। ঘটনাক্রমে পুনরায় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তখন আপনি তাওবা করার সাথে সাথে আল্লাহর রাস্তায় কিছু সাদকাও করবেন। অতপর উভয় অবস্থায় পর্যালোচনা করে দেখলে আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তাওবার সাথে সাথে সাদকা করলে আত্মা অধিকতর বিশুদ্ধ হয়ে থাকে এবং অসৎ চিন্তার মুকাবিলায় আপনি অধিক সাফল্যের সাথে অগ্রসর হতে পারবেন।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে এ সহজ-সরল পন্থা অনুসরণেরই নির্দেশ দান করেছে। নিষ্ঠার সাথে এর অনুশীলন করলে কঠোর সাধনা, তপস্যা কিংবা মোরাকাবা ছাড়াই আপনি নিজ গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদির সাথে অবস্থান করে এবং সমস্ত সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেই আল্লাহ তাআলার সাথে সংযোগ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক যাচাই করার উপায়

এখন একটি সমস্যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। তা এই যে, আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সংযোগ-সম্পর্ক কতখানি স্থাপিত হয়েছে তা কিভাবে ও কি উপায়ে বুঝবো ? আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে তা-ই বা আমরা কি উপায় বুঝবো ? এর জবাবে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে, এটা অনুভব করার জন্য স্বপ্নযোগে 'সু-সমাচার প্রাপ্ত' অথবা কাশফ ও কারামত যাহির করার প্রয়োজন নেই ; কিংবা অন্ধকার কুঠরীর মধ্যে বসে আলোক প্রাপ্তির

অপেক্ষা করার কোনো আবশ্যক নেই। এ সম্পর্ক পরিমাপ করার ব্যবস্থা তো আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে করেই রেখেছেন। আপনি জাগ্রত অবস্থায় এবং দিনের বেলায়ই তা পরিমাপ করে দেখতে পারেন। নিজের জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা এবং আপনার চিন্তা ও ভাবধারা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখুন। নিজের হিসেব-নিকেশ আপনি নিজেই ঠিক করে দেখুন ঃ আল্লাহ্ তাআলার সাথে যে চুক্তিতে আপনি আবদ্ধ রয়েছেন তা কতখানি পালন করছেন। আল্লাহ্ তাআলার আমানতসমূহ কি আপনি একজন আমানতদার হিসেবে ভোগ-ব্যবহার করছেন, না আপনার দ্বারা কোনো প্রকার খেয়ানত হচ্ছে ? আপনার সময়, শ্রম, যোগ্যতা, প্রতিভা, ধন-সম্পদ ইত্যাদির কতটুকু আল্লাহ্ তাআলার কাজে ব্যয়িত হচ্ছে আর কতটুকু অন্য পথে নিয়োজিত হচ্ছে ? আপনার স্বার্থ কিংবা মনোভাবের উপর আঘাত লাগলে আপনি কতখানি বিরক্ত ও রাগান্বিত হন। আর আল্লাহ্ তাআলার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয় তখনই বা আপনার ক্রোধ, মর্মপীড়া, মানসিক অশান্তি কতখানি হয় ? এরূপ আরো অনেক প্রশ্ন আপনি নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন এবং এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবের উপর ভিত্তি করে আপনি প্রত্যহ বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক ও যোগ আছে কিনা ? থাকলে তা কতখানি এবং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমে যাচ্ছে ? কাজেই স্বপ্নের সুসংবাদ, কাশফ-কারামত, কিংবা নূরের তাজাল্লী ইত্যাদি অতি-প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হতে আপনি বিরত থাকুন। প্রকৃতপক্ষে এ বস্তুজগতের প্রবঞ্চনামূলক বৈচিত্রের মধ্যে অবস্থান করে তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবনের চেয়ে বড় কাশফ আর কিছুই নেই। শয়তান এবং তার চেলা-চামুণ্ডাদের ক্রমাগত প্রলোভন ও ভয়ভীতির মুকাবিলায় সরল-সত্য পথে মযবুতভাবে কায়েম থাকা অপেক্ষা বড় কারামত আর কিছুই হতে পারে না। কুফরী, ফাসেকী ও গুমরাহীর ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলো দেখতে পাওয়া এবং তা অনুসরণ করার চেয়ে কোনো বড় নূরের তপস্যা থাকতে পারে না। আর মু'মিনগণ সবচেয়ে বড় সুসংবাদ লাভ করতে চাইলে—আল্লাহ্ তাআলাকে নিজের রব (প্রভু ও পালনকর্তা) হিসেবে স্বীকার করে এর উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকা এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে চলাই হচ্ছে এর একমাত্র উপায় ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ حم السجدة : ٣٠

"যাঁরা বলছে যে, আল্লাহ্ আমাদের রব অতপর তারা এ ব্যাপারে অটল-অবিচল থাকে, নিসন্দেহে তাদের উপর ফেরেশতা নাযিল হয় (এবং তাদেরকে বলে) তোমরা ভয় করো না, দুঃখ করো না, বরং তোমাদের সাথে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার সুসংবাদে আনন্দিত হও।"–সূরা হা-মীম আস সিজদা ঃ ৩০

আখেরাতকে অগ্রাধিকার দান

আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক-সংযোগ স্থাপনের পর আমি আপনাদের আরো একটি কথা বলতে চাই। তা এই যে, আপনারা সকল অবস্থায়ই পার্থিব সুযোগ-সুবিধার চেয়ে আখেরাতের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করবেন ও নিজেদের প্রত্যেকটি কাজের মূলে আখেরাতের সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষাকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন।

কুরআন মজীদ আমাদেরকে বলছে, স্থায়ী অনন্ত জীবন লাভের ক্ষেত্র হচ্ছে আখেরাত। দুনিয়ার এ অস্থায়ী বাসস্থানে আমাদেরকে শুধু পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত সামান্য সাজ-সরঞ্জাম, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা-ইখতিয়ার, সামান্য অবকাশ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমাদের মধ্য হতে কতো লোক আল্লাহ্ তাআলার জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্য প্রতিপন্ন হতে পারে আমাদেরকে সেই পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি কাজ ও রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের কতখানি কৃতিত্ব রয়েছে, রাস্তাঘাট ও বাড়ী নির্মাণে আমরা কতখানি পটু কিংবা এক শানদার সভ্যতা সংস্কৃতি গঠনে আমরা কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। বরং আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত আমানতসমূহের ব্যাপারে আমরা তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালনে কতখানি যোগ্যতার অধিকারী এটাই হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার মূল বিষয়। আমরা কি এখানে বিদ্রোহী ও স্বাধীন হয়ে বসবাস করি, না তাঁর অনুগত বান্দাহ হিসেবে ; আল্লাহ্র দুনিয়ায় আল্লাহ্র মর্জি পূরণ করি, না নিজেদের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইচ্ছা পূরণ করি ; আল্লাহ্র দুনিয়াকে তাঁর ইচ্ছানুসারে সুসজ্জিত করি, না বিভেদ-বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য শয়তানী শক্তিগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করি, না তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকি, এটাই হলো আমাদের পরীক্ষা। জান্নাতে হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের যে প্রথম পরীক্ষা হয়েছিলো মূলত তাও ছিলো ঠিক এ পরীক্ষা। আর আখেরাতে জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে মানব জাতির মধ্য হতে

যাদেরকে নির্বাচিত করা হবে তাও হবে এ চূড়ান্ত প্রশ্নটির ভিত্তিতে। সুতরাং সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল মাপকাঠি এটা মোটেই নয় যে, কে রাজ সিংহাসনে বসে পরীক্ষা দিয়েছে, আর কে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কাউকে বিরাট সাম্রাজ্য দান করে পরীক্ষা করা হয়েছে আর কাউকে জীর্ণ কুটিরে বসিয়ে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সাময়িক সুযোগ-সুবিধা যেমন সাফল্যের কোনো প্রমাণ নয়, তেমনি তা কোনো অসুবিধা ও ব্যর্থতারও লক্ষণ নয়। আসল কামিয়াবী–যেদিকে আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকা দরকার তাহলো এই যে, আমরা দুনিয়ার এ পরীক্ষা কেন্দ্রের যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যাই হোক না কেন, আমরা যেন নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাহ এবং তাঁর মর্জির সঠিক তাবেদার সাব্যস্ত করতে পারি। একমাত্র এভাবেই আমরা আখেরাতে আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাহদের নির্দিষ্ট মর্যাদা লাভে সক্ষম হবো।

বন্ধুগণ ! এটাই হচ্ছে আসল কথা। কিন্তু এটা এমন একটি বিষয় যে, একবার মাত্র জানলে, বুঝলে ও স্বীকার করলেই এ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে না, বরং সদা-সর্বদা স্মরণ রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও যত্ন করতে হয়। নতুবা এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে, আখেরাতকে অস্বীকার না করেও আমরা হয়তো আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের ন্যায় নিছক পার্থিব কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বো। কেননা পরকাল হচ্ছে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অবস্থিত, শুধু মৃত্যুর পরেই তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। পার্থিব জীবনে আমরা শুধু চিন্তা কল্পনা-শক্তির সাহায্যেই এর ভালো-মন্দ ফলাফল অনুভব করতে পারি। পক্ষান্তরে এ দুনিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, এটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব এবং ভালো-মন্দ প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা সর্বক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এর বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনাবলী ও পরিণতিকে অনেক সময়ে চূড়ান্ত বলে আমাদের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আখেরাত সম্পর্কিত কোনো কাজ হলে সেই বিষয় শুধু আমাদের অন্তরের এক কোণায় লুক্কায়িত বিবেকে সামান্য কিছুটা তিক্ততা অনুভব করি মাত্র, অবশ্য যদি তা সজীব থাকে। কিন্তু আমাদের পার্থিব কোনো স্বার্থ বিনষ্ট হলে আমাদের প্রতিটি লোমকূপও তার জন্য ব্যথা অনুভব করে। আমাদের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নির্বিশেষে সমাজের সাধারণ লোকজন সকলেই তা অনুভব করতে পারে। অনুরূপভাবে আমাদের আখেরাত যদি সাফল্য হয়, তবে আমাদের অন্তরের একটি নিভৃত কোণ ছাড়া অন্য কোথায়ও এর স্নিগ্ধ প্রভাব অনুভূত হয় না। অবশ্য তাও যদি আমাদের গাফলতির দরুন সম্পূর্ণরূপে নিস্পন্দ হয়ে গিয়ে না থাকে। কিন্তু আমাদের

পার্থিব সাফল্যকে আমাদের গোটা সত্ত্বা ও ইন্দ্রিয়নিচয় অনায়াসে অনুভব করতে পারে এবং আমাদের সমগ্র পরিবেশ তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এ কারণেই একটি ধারণা বা বিশ্বাস হিসেবে আখেরাতকে স্বীকার করা হয়তো কোনো কঠিন কাজ নয় ; কিন্তু গোটা চিন্তাধারা, নৈতিক চরিত্র ও কর্মজীবনের সমগ্র ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদ হিসেবে এটাকে গ্রহণ করে তদনুযায়ী আজীবন কাজ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মুখে দুনিয়া 'কিছু নয়' বলা যতই সহজ হোক না কেন ; কিন্তু অন্তর হতে এর বাসনা-কামনা এবং চিন্তাধারা হতে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদূরিত করা মোটেই সহজ নয়। এ অবস্থায় উপনীত হবার জন্য বহু চেষ্টা-যত্ন আবশ্যক। আর অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলেই তা স্থায়ী হতে পারে।

আখেরাতের চিন্তার লালন

আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করবেন যে, আমরা সেই জন্য কিরূপ চেষ্টা করতে পারি ? এবং এ জন্য আমরা কোন্ কোন্ জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করবো ? এর জবাবে আমি বলতে চাই যে, এরও দুটি উপায় রয়েছে ঃ একটি চিন্তা ও আদর্শমূলক। অপরটি হলো বাস্তব কর্মপন্থা।

চিন্তা ও আদর্শিক অনুশীলনের পন্থা এই যে, আপনি শুধু اٰمَنْتُ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ। 'আমি আখেরাতের প্রতি ঈমান আনলাম।' একথাটি মুখে উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হবেন না। বরং অর্থ বুঝে কালামে পাক অধ্যয়নের অভ্যাস করবেন। এর ফলে আপনার বিশ্বাসের চোখে ক্রমাগত পার্থিব দুনিয়ার এ আবরণের অন্তরালে অবস্থিত আখেরাত অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ধরা দেবে। কারণ কালামে পাকে সম্ভবত এমন একটি পৃষ্ঠাও নেই যেখানে কোনো না কোনোরূপে আখেরাতের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে আখেরাতের এমন বিস্তারিত নকশা দেখতে পাবেন যে, আপনার মনে হবে, যেন কেউ চাক্ষুসভাবে দেখার পরেই এটা বর্ণনা করছে। এমনকি অনেক স্থানে এ চিত্র এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে বলে অনুভব করতে থাকে তখন মনে হয় যেন, এ জড় জগতের হাল্কা পর্দাখানা একটু সরে গেলেই বর্ণিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতো। সুতরাং নিয়মিত কুরআন শরীফ বুঝে তেলাওয়াত করতে থাকলে মানুষের মনে ক্রমশ আখেরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা স্থায়ী হতে পারবে। তখন সে একথাটি সর্বদা স্মরণ রাখতে পারবে যে, তার স্থায়ী বাসভূমির সন্ধান লাভ মৃত্যুর পরই সম্ভব এবং দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনেই এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

হাদীস অধ্যয়ন করলে এ মনোভাব আরও বলবত ও মযবুত হয়। কারণ হাদীস শরীফে পরলোক সম্পর্কে প্রায় চাক্ষুস অভিজ্ঞতার মতোই বিবরণ সন্নিবিষ্ট রয়েছে। এছাড়া হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা আখেরাত সম্পর্কে কতখানি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তা থেকে তা জানা যায়। কবর যিয়ারত করলে এ বিষয়ে আরো সাহায্য লাভ করা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন যে, মানুষ এর সাহায্যে নিজের মৃত্যুর স্মরণ করতে সক্ষম হয় এবং লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ এ দুনিয়ার বুকে অবস্থান করেও একথা তার মনে জাগরুক রাখতে পারে যে, সকল মানুষ যেখানে গিয়েছে এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোক যেখানে পৌঁছেছে তাকেও একদিন সেখানে যেতে হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে গুমরাহ লোকেরা যে সমস্ত মাযারকে মকছুদ হাসিল কিংবা মুশকিল আসানের কেন্দ্র হিসেবে খাড়া করেছে, তার পরিবর্তে সাধারণ গরীব লোকদের কবরস্থান এ দিক দিয়ে অনেক বেশী উপকারী। অথবা এ উদ্দেশ্যে প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের শূন্য ও পাহারাদার বিবর্জিত বিরাটাকার কবরগুলো পরিদর্শন করা চলে।

অতপর বাস্তব কর্মপন্থার কথায় আসুন। এ পার্থিব জীবনে আপনাকে ঘর-সংসার, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, নিজের শহর ও দেশের ব্যবস্থাপনা, আদান-প্রদান এবং অর্থনৈতিক কাজ-কারবার—এক কথায় জীবনের প্রতি পদেই আপনাকে উভয় সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং একদিকে আখেরাত বিশ্বাস আর অপরদিকে দুনিয়াদারী আপনাকে হাতছানি দেয়। এমতাস্থায় আপনাকে প্রথমোক্ত পথেই অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যদি নফসের দুর্বলতা কিংবা আলস্যবশত আপনি কখনো ভিন্ন পথেই অগ্রসর হন, তবে সেই কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই আপনি পথ পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন, ভুল পথে আপনি অনেক দূর অগ্রসর হলেও কোনো কথা নেই। তাছাড়া আপনি মাঝে মাঝে নিজের হিসেব-নিকেশ করে দেখবেন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দুনিয়া আপনাকে নিজের দিকে টানতে সমর্থ হয়েছে আর আপনিইবা কতবার আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছেন। এ পর্যালোচনার দ্বারাই আপনি স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন যে, আখেরাত সম্পর্কে ধারণা-বিশ্বাস কতখানি মযবুত হয়েছে আর কতখানি আপনাকে অভাব পূরণ করতে হবে। যতখানি অভাব দেখবেন তা নিজেই পূরণের চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে বাহির থেকে কোনো প্রকার সাহায্য লাভ করতে হলে আপনাকে সর্বপ্রথম দুনিয়াদার

লোকদের সংশ্রব পরিত্যাগ করতে হবে এবং আপনার জানা মতে যাঁরা দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, এ ধরনের নেক লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু একটি কথা আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনার নিজের চেষ্টা ছাড়া কোনো গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি করার বাস্তব কোনো পন্থা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কিংবা নিজের মধ্যে মূল উপাদান পর্যন্ত বর্তমান নেই, এমন গুণ সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

অযথা অহমিকা বর্জন

তৃতীয় যে বিষয়ে আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিতে চাই তা এই যে, গত কয়েক বছর যাবৎ ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আপনাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক চরিত্র এবং আপনাদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যতটুকু সংস্কার সাধিত হয়েছে সে জন্য আপনাদের মনে যেন আদৌ কোনো অহমিকা দেখা না দেয়। আপনারা যেন ব্যক্তিগত কিংবা সাংগঠনিকভাবে কখনো এরূপ ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে, আমরা এখন পূর্ণত্ব লাভ করেছি, যা কিছু যোগ্যতা অর্জন করা দরকার ছিলো, তার সবই আমরা হাসিল করে ফেলেছি। সুতরাং এখন আর আমাদের কাম্য এমন কোনো বস্তু নেই. যে জন্য আমাদেরকে আরো চেষ্টা-যত্ন করতে হবে। আমাকে এবং জামায়াতের অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকে অনেক সময়ই একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বেশ কিছুদিন যাবত কিছু সংখ্যক লোক জামায়াতে ইসলামীর—প্রকৃতপক্ষে জামায়াত পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের মূল্য হ্রাস করার মতলবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, এ জামায়াত নিছক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। অন্যান্য দলগুলোর মতোই এরা কাজ করছে। এ প্রতিষ্ঠানে আত্মশুদ্ধি বা আধ্যাত্মিকতার কোনো নাম-নিশানা নেই। এর কর্মীদের মধ্যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং আখেরাত চিন্তার অভাব রয়েছে। এ দলের পরিচালক নিজে যেমন কোনো পীরের মুরীদ নয়, তেমনি তিনি কোনো খানকা হতেও তাকওয়া পরহেযগারী বা ইহসান-কামালিয়াতের ট্রেনিং লাভ করেননি। আর তাঁর সহকর্মীরাও যে তেমন কোনো ট্রেনিং-এর সুযোগ পাবেন, তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এ ধরনের প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী এবং আন্দোলনের প্রতি আগ্রহশীল লোকদের মনে জামায়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে পুনরায় এমন আস্তানায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করা, যেখানে কুফরীর আশ্রয়ে থেকে ইসলামের আংশিক খেদমত করাকেই আজ পর্যন্ত এক বিরাট কীর্তিরূপে গণ্য করা হচ্ছে, যেখানে দীন

ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করার কোনো কল্পনারই অস্তিত্ব নেই। বরং যেখানে এ ধরনের কোনো পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করার পর নানাভাবে এটাকে এক অধর্মীয় প্রস্তাব বলে প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে এবং এরূপ প্রস্তাবকে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, কুফর ও ফাসেকীর পরিবর্তে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বিস্তারের কল্পনাকে একটি নিতান্ত বৈষয়িক চিন্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ কারণেই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে খানকার আত্মশুদ্ধি ও ইসলামী আত্মশুদ্ধির মধ্যকার পার্থক্য উদঘাটন করতে হয় এবং প্রকৃত তাকওয়া, পরহেযাগারী ও ইহসানের সঠিক পরিচয় যা ইসলামের কাম্য—পরিষ্কার করে বর্ণনা করতে হয় এবং ধর্ম শিল্পে লোকগণ যে সনাতন ও কামালিয়াতের শিক্ষা বা ট্রেনিং দিচ্ছেন, তার সাথে ইসলামের পার্থক্য কতটুকু তা বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেই সাথে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক অনুসৃত সংশোধন ও ট্রেনিং পদ্ধতি এবং এর ফলাফলও আমাদেরকে প্রকাশ করতে হয়, যেন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক চেতনা সম্পন্ন যে কোনো লোক একথা বুঝতে পারেন যে, জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়েই মানুষের মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারী ও ইহ্সানের যে পবিত্র ভাবধারা সৃষ্টি হতে শুরু করে, তা জীবন ব্যাপী আত্মশুদ্ধির ট্রেনিং লাভের পরও–এমনকি ট্রেনিংদাতাদের মধ্যেও দেখা যায় না।

এ সকল কথা আমরা আমাদের সমালোচকদের বে-ইনসাফীর কারণেই বলতে বাধ্য হচ্ছি। নিছক আত্মরক্ষার জন্য নয়, বরং ইসলামী আন্দোলনের নিরাপত্তার জন্য এটা আমাদের বলতে হয়। কিন্তু এ সমস্ত কথার ফলে আমাদের সহকর্মীদের মনে যেন কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার কিংবা নিজেদের 'কামালিয়াত' সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা না জন্মে, সে জন্য আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহ্ না করুন, আমাদের মধ্যে যদি কোনো প্রকার মিথ্যা অহমিকা দেখা দেয়, তবে এ পর্যন্ত আমরা যতটুকু লাভ করেছি তাও হয়তো হারিয়ে বসবো।

এ বিপদ হতে আত্মরক্ষার জন্যই আমি আপনাদেরকে তিনটি নিগূঢ় সত্য ভালো করে বুঝে নিতে এবং তা কখনো বিস্মৃত না হতে অনুরোধ করি।

কামালিয়াত (পূর্ণত্ব) একটি সীমাহীন ব্যাপার, এর শেষ সীমা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, এর শীর্ষদেশে আরোহণ করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা এবং কোথাও পৌছিয়ে একথা ব্যক্ত না করা যে, সে কামেল হয়ে গিয়েছে। কোনো ব্যক্তি যে মুহূর্তে এ

ধারণায় পতিত হবে সাথে সাথেই তার উন্নতি থেমে যাবে। শুধু যে থেমে যাবে তা-ই নয়, বরং সেই সাথে তার অবনতির সূত্রপাত হবে। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল উচ্চস্থানে উন্নীত হওয়ার জন্যই নয় বরং সেখানে টিকে থাকতে হলেও অবিশ্রান্ত চেষ্টা-তৎপরতা আবশ্যক। কারণ এ চেষ্টার ধারা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে নিম্নভূমির আকর্ষণ মানুষকে নীচের দিকে টানতে আরম্ভ করে। কোনো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কেবলমাত্র নীচের দিকে তাকিয়ে সে কতখানি উপরে উঠেছে, তা দেখা উচিত নয়। বরং তার আর কতখানি উপরে উঠতে হবে এবং এখনো সে কতখানি দূরে রয়েছে এটাই তার দেখা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম আমাদের সামনে মনুষত্বের যে উচ্চতম আদর্শ উপস্থাপিত করেছে, এর প্রাথমিক স্তরসমূহও অন্যান্য অনৈসলামিক ধর্ম ও মতবাদগুলোর উচ্চতম আদর্শের তুলনায় অনেক ঊর্ধে অবস্থিত। এটা আদৌ কোনো কল্পনাপ্রসূত 'মান' নয় বরং এ পার্থিব জীবনেই আম্বিয়ায়ে কিরাম, মহানুভব সাহাবাগণ এবং জাতির আদর্শ পুরুষগণ পবিত্র জীবনধারা আমাদের সামনে ইসলামের মহান আদর্শ সম্পর্কে পথনির্দেশ করছে। এ আদর্শ 'মান' সর্বদা আপনার সামনে রাখবেন। এভাবে আপনার তথাকথিত কামালিয়াতের বিভ্রান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন এবং নিজেদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হবেন। পরন্তু উন্নতি লাভের চেষ্টা-তৎপরতার জন্য এটা এমনভাবে অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকবে, যার ফলে আপনি আজীবন সংগ্রাম-সাধনার পরও মনে করবেন যে, এখনো উন্নতির অনেক স্তর বাকী রয়েছে। আপনার আশেপাশে মুমূর্ষ রোগীদের দেখে নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে একটুও গর্ববোধ করবেন না। আপনারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার সেই বীর পাহ্লোয়ানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যাদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবেই আপনারা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছেন। দীন-সম্পদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অগ্রসর লোকদের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং বৈষয়িক ধন-সম্পদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকদেরকে সামনে রাখাই ঈমানদার লোকদের কর্তব্য, যেন তার ভিতর থেকে দীন-সম্পদ লাভের তৃষ্ণা বিদূরিত না হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে যতটুকু বিষয়-সম্পত্তি দান করেছেন তাতেই সে আল্লাহর শোকর করতে পারে এবং অল্পতেই যেন তার ধন-সম্পদের পিপাসা নিবৃত হয়।*

---

* একটি হাদীসে নবী করীম (স) ঠিক একথাই এরশাদ করেছেন ঃ

من نظر فی دینه الی من هو فوقه فاقتدی به ونظر فی دنیاء الی من هو دونه فحمد اللّه علی مافضله اللّه علیه کتبه اللّه شاکرا صابرا ومن نظر

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তৃতীয়ত, আমাদের জামায়াত এ পর্যন্ত যতটুকু গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, প্রকৃতপক্ষে শুধু তা বর্তমান বিকৃত পরিবেশের কারণেই সম্ভব হয়েছে। কেননা এ ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমরা যে ক্ষীণ শিখার একটি প্রদীপ জ্বলাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাই এখন উজ্জ্বল প্রকটিত হয়ে দেখা দিয়েছে। নতুবা প্রকৃত সত্য কথা এই যে, ইসলামের নিম্নতম আদর্শের সাথে আমাদের চেষ্টা-তৎপরতার তুলনা করলেও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে–ব্যক্তিগত জীবন ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে–কেবলমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়বে। সুতরাং আমরা যদি কখনো নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করি তবে তা যেন শুধু বিনয় প্রকাশের জন্যই না হয়, বরং তা যেন আন্তরিক স্বীকৃতি হয়। এর ফলে আমাদের প্রত্যেকটি দুর্বলতা যেন সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে এবং তা দূর করার জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা যেন তীব্রতর হয়।

ট্রেনিং কেন্দ্রসমূহের উপকারিতা

এ কাজে আপনাদের সাহায্যের জন্যই জামায়াতের পক্ষ থেকে ট্রেনিং-এর নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যসূচী অনুসারে যে সমস্ত ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তাতে জামায়াতের রুকন বা মুত্তাফিক সকলেই শরীক হতে পারেন। ট্রেনিং-এর মেয়াদ ইচ্ছা করেই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, যেন ব্যবসায়ী, কর্মচারী, কৃষিজীবী সকল শ্রেণীর লোকই এটা হতে সহজে ফায়দা হাসিল করতে পারেন। ট্রেনিং কোর্সের দুটি ভাগ রয়েছে ঃ একটি শিক্ষামূলক, অপরটি অনুশীলনমূলক। প্রথম অংশে আমাদের লক্ষ্য হলো—শিক্ষার্থীগণ অল্প সময়ের মধ্যেই যেন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ; ফিকাহ শাস্ত্রের হুকুম ও আহকাম এবং জামায়াতের পুস্তকাদির একটি প্রয়োজনীয় অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হয়। এর ফলে ট্রেনিং গ্রহণকারী কর্মী যেন সহজেই দীনি

دينه الى من هو دونه ونظر فى دنياء الى من فوقه فاسف على مافاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا ۔

"যে ব্যক্তি নিজের দীনের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উন্নত লোকের প্রতি দৃষ্টি রেখে তার অনুসরণ করবে এবং পার্থিব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে দেখে আল্লাহ তাআলার দান সামগ্রীর শুকরিয়া প্রকাশ করবে, সে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীলরূপে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোকের প্রতি লক্ষ্য করবে এবং পার্থিব ব্যাপারে অধিক ধনশালীদের প্রতি লক্ষ্য করবে, কোনো বিষয়ের অভাব থাকলে সেই জন্য সে আফসোস করবে, আল্লাহর দরবারে সেই ব্যক্তি কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্যশীলরূপে পরিগণিত হতে পারবে না।"

ব্যবস্থা, তার দাবী, তদনুযায়ী জীবনযাপনের পন্থা এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত কর্মসূচী স্পষ্ট বুঝতে পারে। সেই সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণের জন্য কোন্ ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের আবশ্যক, তাও যেন সে উপলব্ধি করতে পারে। কর্মসূচীর অনুশীলনমূলক অংশের উদ্দেশ্য এই যে, এর মাধ্যমে আমাদের কর্মীগণ অন্তত কিছুদিন এ স্থানে সমবেতভাবে স্বচ্ছ ও নির্মল ইসলামী পরিবেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করতে পারবে। এর ফলে তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তীতা, শৃংখলা রক্ষা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং প্রীতি সৌহার্দের অভ্যাস জন্মাবে, এছাড়া একে অপরের গুণাবলী আহরণ করতে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতাসমূহ দূর করার সুযোগ লাভ করবে। সর্বোপরি তারা কয়েক দিনের জন্য হলেও নিরবচ্ছিন্ন সাংসারিক কাজ-কর্ম হতে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার জন্যই নিজেদের সমস্ত চিন্তা, লক্ষ্য এবং কর্মতৎপরতা কেন্দ্রিভূত করতে সক্ষম হবে।

এজন্য অন্ততপক্ষে প্রত্যেক জেলায় এক একটি করে ট্রেনিং কেন্দ্র স্থায়ীভাবে স্থাপন করার জন্য আমরা আন্তরিক আগ্রহ পোষণ করি। কিন্তু এ ধরনের ট্রেনিং কেন্দ্র পরিচালনার জন্য আমাদের কাছে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ কারণেই আপাতত লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান ও করাচীতে সাময়িকভাবে ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।*

এতদসত্ত্বেও এ সামান্য ব্যবস্থা দ্বারাই আপনাদের যথেষ্ট উপকার হবে বলে আমি আশা করি। ইনশাআল্লাহ ট্রেনিং কেন্দ্রের কর্মসূচী অনুশীলনের পর নিজেরাই এর বিরাট উপকারিতা অনুভব করতে পারবেন। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে, জামায়াত যথার্থই একটি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আমি এ কর্মসূচীর মাধ্যমে যতবেশী সম্ভব ফায়দা হাসিল করার জন্য সমস্ত কর্মীকে অনুরোধ করছি।

নিজেদের ঘর সামলান

অতপর আমি আপনাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের লোকজন সংশোধন সম্পর্কে বলতে চাই। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

* বর্তমানে বাংলাদেশে অনুরূপ ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا –যে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজনের অন্ন-বস্ত্রের জন্য আপনারা চিন্তা করেন, তারাও যাতে দোযখের ইন্ধনে পরিণত না হয়, সেদিকেও আপনাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। তাদের পরিণাম যাতে শুভ হয় এবং জান্নাতের পথেই তারা অগ্রসর হয়, সেই জন্য অপরকে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি কেউ স্বেচ্ছায় ভুল পথেই অগ্রসর হয় তবে সেজন্য আপনার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। মোটকথা, তাদের অশুভ পরিণতির ব্যাপারে আপনার যেন কোনো সহযোগিতা না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমার কাছে অনেক সময় অভিযোগ করা হয় যে, জামায়াতের কর্মীগণ সাধারণ মানুষের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য যতটা চেষ্টা করেন নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততির সংশোধনের জন্য ততটা চেষ্টা করেন না। হয়তো কোনো কোনো লোকের বেলায় এ অভিযোগ সত্য হতে পারে, আবার কারোও বেলায় হয়তো বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের অবস্থা পর্যালোচনা করা আমার পক্ষে মুশকিল। এজন্যই আমি এ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করতে চাই।

আমাদের একান্ত প্রিয়জনকে শান্তি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে দেখে আমাদের চক্ষু যাতে জুড়ায় এবং প্রাণ-মন শীতল হয় সেজন্য আমাদের সকলেরই ঐকান্তিক বাসনা থাকা উচিত এবং সেজন্য আমাদের চেষ্টা ও যত্ন থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

> "হে আমাদের রব ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের এমন গুণ বিশিষ্ট করে তোল যে, যাদের দেখে যেন আমাদের চক্ষু জুড়ায় এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের অনুগামী করে দাও।"–সূরা ফুরকান ঃ ৭৪

এ ব্যাপারে জামায়াতের কর্মীদের পরস্পরের জীবন ধারার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। তাদের কেবল আপন-সন্তান-সন্ততিই নয় বরং কর্মীদের সন্তান-সন্ততির সংশোধনের দিকেও খেয়াল রাখা উচিত। কেননা অনেক সময় শিশুকে পিতার তুলনায় পিতার বন্ধুদের প্রভাব সহজেই গ্রহণ করতে দেখা যায়।

পারস্পরিক সংশোধন ও এর পন্থা

নিজেদের ও পরিবারস্থ লোকজনের সংশোধন প্রচেষ্টার সাথে সাথে আপনারা সহকর্মীদের সংশোধনের দিকেও খেয়াল রাখবেন। যারা

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্যের কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য একটি জামায়াতে পরিণত হয়েছে, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাদের বুঝা দরকার যে, তাদের সংগঠন যদি নৈতিকতা ও নিয়ম-শৃংখলার দিক দিয়ে সামগ্রিকভাবে মযবুত না হয়, তবে তাদের মহান উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। সুতরাং তাদের এ অনুভূতির ফল স্বরূপ পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের কাজে সহযোগিতা করা এবং সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য একে অপরকে সাহায্য করা কর্তব্য। এটা হচ্ছে ইসলামের সামগ্রিক সংশোধন প্রচেষ্টার উপায়। আপনি যদি আমাকে আছাড় খেতে দেখেন তা ত্বরিদ্বেগে এসে আমাকে সাহায্য করবেন। আর আমি যদি আপনাকে ভুল করতে দেখি তো তখনই আমি অগ্রসর হয়ে আপনার হাত ধরবো। আমার পরিচ্ছদে কোনো কালিমা দেখলে আপনারা তা পরিষ্কার করবেন। আর আপনাদের পোশাকে কোনো ময়লা দেখলে আমিও তা পরিষ্কার করবো। আবার যে কাজে আমার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে আপনারা মনে করবেন আমাকে তা অবশ্যই জানাবেন, তেমনি যে কাজে আপনাদের মঙ্গল হবে বলে আমি মনে করবো আপনাদেরকে তা জানাব। বস্তুত বৈষয়িক ব্যাপারে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে যেমন সামগ্রিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের রীতি চালু হলে গোটা জামায়াতের নৈতিক সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের সঠিক পন্থা এই যে, কারো কোনো কাজে আপনার আপত্তি থাকলে কিংবা কারো বিরুদ্ধে আপনার কোনো অভিযোগ থাকলে, সে বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে প্রথমে বিষয়টি সুষ্ঠুরূপে বুঝতে চেষ্টা করবেন। পরে আপনি প্রথম অবকাশেই তার সাথে সাক্ষাত করে সেই সম্পর্কে নির্জনে আলাপ করবেন। এতেও যদি তার সংশোধন না হয় এবং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার আমীরকে এটা জানাবেন। প্রথমে তিনি নিজেই তার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করবেন। পরে আবশ্যক হলে জামায়াতের বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করবেন। এ সময়ের মধ্যে উক্ত বিষয়ে কখনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবর্তমানে আলোচনা করা স্পষ্ট গীবত বা পরচর্চায় পরিণত হবে। সুতরাং এটা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

পারস্পরিক সমালোচনার সঠিক পন্থা

নিজেদের মধ্যকার দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার আর **একটি** উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে সমালোচনা। কিন্তু সমালোচনার সঠিক সীমা ও **পদ্ধতি**

সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন না করলে এতে ভয়ানক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। এজন্যই আমি বিস্তারিতভাবে এর সীমা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই ঃ

এক ঃ সকল স্থানে ও সকল সময়ে আলোচনা করা চলবে না বরং বিশেষ বৈঠকে আমীরে জামায়াতের প্রস্তাব কিংবা অনুমতিক্রমেই তা করা যেতে পারে।

দুই ঃ সমালোচনাকারী সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলাকে হাযির-নাযির জেনে নিজের মনের অবস্থা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন যে, তিনি সততা ও শুভাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই সমালোচনা করছেন, না কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ এর মূলে সক্রিয় রয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থায় নিসন্দেহে সমালোচনা করা যেতে পারে, অন্যথায় কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য না করে নিজের অন্তর হতে এ কালিমা রেখা দূর করার জন্য তার সচেষ্ট হওয়া উচিত।

তিন ঃ সমালোচনার ভঙ্গী ও ভাষা এমন হওয়া উচিত, যা শুনে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আপনি সত্যই সংশোধনের বাসনা পোষণ করছেন।

চার ঃ সমালোচনার উদ্দেশ্যে কথা বলার পূর্বে আপনার অভিযোগের সমর্থনে কোনো বাস্তব প্রমাণ আছে কিনা, তা অবশ্যই ভেবে দেখবেন। অহেতুক কারো বিরুদ্ধে কথা বলা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ, এর ফলে সামাজিক জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেয়।

পাঁচ ঃ যে ব্যক্তির সমালোচনা করা হবে, তার অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সমালোচকের বক্তব্য শ্রবণ করা এবং সততার সাথে তা ভেবে দেখা কর্তব্য। অভিযোগের যে অংশ সত্য, তা অকপটে স্বীকার করা এবং যে অংশ সত্য নয় তা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা উচিত। সমালোচনা শুনে রাগান্বিত হওয়া অহংকার ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ।

ছয় ঃ সমালোচনা এবং এর জবাবের ধারা সীমাহীনভাবে চলা উচিত নয়, কেননা এতে একটি স্থায়ী বিরোধ ও কথা কাটাকাটির সূত্রপাত হতে পারে। আলোচনা শুধু উভয় পক্ষের বক্তব্য সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্তই চলতে পারে। এরপরও যদি বিষয়টির মীমাংসা না হয়, তবে আলোচনা সেখানেই স্থগিত রাখুন, যেন উভয় পক্ষ ধীরস্থীরভাবে এবং শান্ত মনে নিজেদের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

অতপর সে বিষয়ে যদি একান্তেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তবে পরবর্তী বৈঠকে পুনরায় তা উত্থাপন করা যেতে পারে কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনাদের জামায়াতে বিরোধী বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকা এবং উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে বিরোধের সমাপ্তি ঘটা আবশ্যক।

উল্লেখিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সমালোচনা করা হবে তা শুধু কল্যাণকরই নয় জামায়াতের নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে। এ ধরনের ব্যবস্থা ছাড়া কোনো সংগঠনই সঠিকভাবে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং কাউকেও এ সমালোচনার ঊর্ধে রাখা উচিত নয়। আপনাদের আমীর, মজলিশে শুরা অথবা গোটা জামায়াতই হোক না কেন, কেউই সমালোচনার ঊর্ধে নয়। আমি এটাকে জামায়াতের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য একান্ত অপরিহার্য মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যেদিন আমাদের জামায়াতে এ সমালোচনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, ঠিক সেদিন হতেই আমাদের অধপতন শুরু হবে। এজন্যই আমি প্রথম হতেই প্রত্যেকটি সাধারণ সম্মেলনের পরে জামায়াতের কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনার সমালোচনা-পর্যালোচনার জন্য রুকনদের একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠান করে আসছি। এ ধরনের বৈঠকে সর্বপ্রথমে আমি নিজেকে সমালোচনার জন্য পেশ করি, যেন আমার বিরুদ্ধে কিংবা আমার কোনো কাজে কারো কোনো আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে তারা সকলের সামনে বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারে। এটা হলে হয় আমার ভুল-ত্রুটির সংশোধন হবে নতুবা আমার জবাব শুনে অভিযোগকারী এবং তার ন্যায় অন্যান্য লোকদেরও ভুল ধারণা দূর হবে। গত রাতে ঠিক এ ধরনেরই একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে প্রকাশ্য ও অবাধ সমালোচনার দৃশ্য আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি জেনে বিস্মিত হলাম যে, জামায়াতের যেসব কর্মী এই প্রথমবার এ ধরনের দৃশ্য দেখার সুযোগ পেয়েছেন, তারা নাকি খুবই মর্মাহত হয়েছেন। তারা কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে এর বিচার করেছেন, আমি জানি না। তবে দূরদৃষ্টি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে তাদের নিকট জামায়াতের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেত। এ ভূখণ্ডে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া এমন কোন্ সংগঠন রয়েছে, যেখানে তিন-চার শত প্রতিনিধি একত্রে একস্থানে বসে কয়েক ঘণ্টা যাবত এরূপ অবাধ ও প্রকাশ্য সমালোচনা করার পরও একখানা চেয়ারও ভাঙ্গে না, একটি মাথাও ফাটে না বরং বৈঠক সমাপ্তকালে কারও মনে এতটুকু কালিমা রেখা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না।

আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ

আর একটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার প্রয়োজন অনুভব করছি। তা এই যে, এখনও আমাদের মধ্যে আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে। একথা যদিও সত্য যে, আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য করলে নিজেদেরকে অনেক সুসংবদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু ইসলামের সুমহান আদর্শ ও আমাদের কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের বর্তমান শৃঙ্খলা ও সংগঠনকে নিতান্তই নগণ্য বলে মনে হবে।

আপনারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক যৎ সামান্য উপায়-উপাদান নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। অথচ ফাসেকী ও জাহেলিয়াতের কয়েক হাজার গুণ অধিক শক্তি এবং কয়েক লক্ষ গুণ বেশী উপায়-উপাদানের মুকাবিলায় শুধু বাহ্যিক জীবন ব্যবস্থারই নয়, বরং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারায়ও আমূল পরিবর্তন সাধন করাই হচ্ছে আপনাদের লক্ষ্য। কিন্তু আপনারাই হিসেব করে দেখতে পারেন, সংখ্যা-শক্তি কিংবা উপায়-উপাদানের দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে আপনাদের কোনো তুলনাই হয় না। এমতাবস্থায় আপনাদের কাছে নৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া আর কোন্ জিনিসটি আছে যার সাহায্যে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের আশা পোষণ করতে পারেন ? আপনাদের সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সমাজ মনে যদি আস্থা জন্মে এবং আপনাদের সংগঠন যদি এতখানি শক্তিশালী হয় যে, জামায়াতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ আবশ্যক বোধে একটি মাত্র ইশারায়ই প্রয়োজনীয় শক্তি সমাবেশ করতে সক্ষম হবেন ; কেবল তখনই আপনাদের মহান উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে দীন ইসলামের বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো জামায়াত তার নির্বাচিত আমীরের নেক কাজে আনুগত্য করা মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স)-এরই আনুগত্যের শামিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাজ মনে করে এ আন্দোলনে শরীক হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার রেযামন্দির উদ্দেশ্যেই নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর নির্বাচিত করেছে, সে উক্ত আমীরের জায়েয ও সংগত আদেশ-নিষেধ পালন করে মূলত তার নয় বরং আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। মোটকথা আল্লাহ এবং তাঁর মনোনীত দীনের (জীবন ব্যবস্থার) সাথে তার যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে, সে ততবেশী আনুগত্য পরায়ণ বলে প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতখানি

পশ্চাদপদ ও দুর্বল থাকবে, আনুগত্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সে ততখানি দুর্বল সাব্যস্ত হবে। আপনার উপর যার যতটুকু প্রভুত্ব নেই, আপনি যাকে শুধু আল্লাহ তাআলার কাজের জন্যই আমীর হিসেবে বরণ করেছেন, একজন লোকের ন্যায় নিজের অভিরুচী, পসন্দ এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে তার নির্দেশ আপনি একান্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলবেন এতদপেক্ষা বড় কুরবানী আর কি হতে পারে ? যেহেতু এ কুরবানী মূলত আল্লাহ তাআলার জন্যই করা হচ্ছে, সেজন্য আল্লাহ তাআলার নিকট হতেও এর বিনিময় বিরাট পুরস্কার পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার পরও কোনো অবস্থাতেই ছোট কাজে রাযী না হয়, আনুগত্য করাটাকে মর্যাদাহানীকর মনে করে অথবা কোনো নির্দেশের ফলে মনে মনে ক্ষুণ্ন হয় এবং এতে বিরক্তি ও অস্বস্তিবোধ করে কিংবা নিজের ইচ্ছা ও স্বার্থের খেলাপ কোনো আদেশ পালনে ইতস্তত করে তবে বুঝতে হবে, সে এখনো তার ইচ্ছা-প্রবৃত্তিকে আল্লাহ তাআলার সামনে সম্পূর্ণরূপে নত করেনি এবং এখনো তার আমিত্ববোধ নিজের দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করেনি।

জামায়াতের নেতৃবৃন্দের প্রতি উপদেশ

জামায়াতের সদস্যগণকে আনুগত্যের অনুরোধ জানাবার সাথে সাথে জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে আমি হুকুম চালাবার সঠিক পন্থা শিক্ষা করার উপদেশ দিচ্ছি। যিনি জামায়াতের কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হবেন, যার অধীনে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে, তার পক্ষে নিজেকে বড় কিছু একটা মনে করে অধস্তন সহকর্মীদের উপর অহেতুক 'কর্তাগিরী' ফলানো কোনো মতেই সংগত নয়। তার পক্ষে কখনো প্রভুত্বের স্বাদ গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং সহকর্মীদের সাথে নম্র ও মধুর ব্যবহার করাই তার কর্তব্য। কোনো কর্মীর মনে বিদ্রোহের ভাব ও উচ্ছৃংখল মনোবৃত্তি মাথাচাড়া দেয়ার দায়িত্ব যেন তার কোনো ভুল কর্মপন্থার উপর অর্পিত না হয়, সেজন্য সর্বদা তার বিশেষভাবে সতর্ক থাকা দরকার। যুবক-বৃদ্ধ, দুর্বল-সবল, ধনী-গরীব ইত্যাদির বাচ-বিচার না করে সকলের জন্য একই ধারা অবলম্বন করা তার পক্ষে সমিচীন নয়। বরং কর্মবণ্টনের সময়ে জামায়াতের বিভিন্ন কর্মীর ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং যে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা লাভের যোগ্য তাকে ততটুকু সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিত। জামায়াতকে তার এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যেন আমীর কোন্ বিষয়ে উপদেশ দিলেন কিংবা আবেদন করলেন, কর্মীগণ যেন তা নির্দেশ হিসেবেই গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ

সম্পন্ন করে। কোনো বিষয়ে যদি আমীরের আবেদন কার্যকরী না হয় এবং বাধ্য হয়ে তিনি হুকুম দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেন তবে তা দ্বারা সাংগঠনিক চেতনারই অভাব প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বেতন ভুক্ত সিপাহীদেরকেই হুকুম দিতে হয়। কিন্তু যে স্বেচ্ছা-সৈনিকরা আপন প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সমবেত হয়েছে, আল্লাহর কাছে নিজেকে নির্বাচিত আমীরের আনুগত্যের বেলায় তাদের নির্দেশের কোনো প্রয়োজন হয় না। তাদের জন্য শুধু এটুকু ইশারাই যথেষ্ট যে, অমুক জায়গায়, অমুক কাজ সম্পাদন করে আপন প্রভুর খেদমত আনজাম দেয়ার সুযোগ তোমার উপস্থিত হয়েছে। যেদিন জামায়াতের আমীর এবং সহকর্মীদের মধ্যে এরূপ ভাবধারা সঞ্চার হবে সেদিন আপনারা দেখতে পাবেন যে, নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে যেসব তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সবগুলোই স্বাভাবিকভাবে দূরীভূত হয়েছে।

শেষ উপদেশ

আমার শেষ আবেদন এই যে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন—রুকন ও মুত্তাফিক নির্বিশেষে—তারা সকলে ।انفاق فى سبيل الله। আল্লাহর পথে ব্যয়ের আগ্রহ ও অভ্যাস অর্জন করুন, আল্লাহর কাজকে ব্যক্তিগত কাজের উপর প্রাধান্য দিতে থাকুন এবং এর জন্য এতখানি আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করুন যে, তা যেন আপনাদেরকে নিশ্চিত মনে বসে থাকতে না দেয়। আপনি কেবলমাত্র নিজেই মুসলমান না হয়ে নিজের পকেটকেও মুসলমান করুন। একথা কখনো ভুলবেন না যে, আল্লাহর হক শুধু আপনার প্রাণ, দেহ এবং সময়ের উপরই সীমাবদ্ধ নয় বরং আপনার পকেটের উপরও তাঁর হক ও দাবী রয়েছে। এ হক আদায়ের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নূন্যতম পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু সর্বাধিক পরিমাণ সম্পর্কে কোনো সীমা নির্দেশ করেননি। এটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব আপনার উপরই ন্যস্ত হয়েছে, এজন্য আপনার বিবেক-বুদ্ধিকে আপনি জিজ্ঞেস করুন, কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলে আপনার ধন-সম্পত্তিতে আল্লাহ তাআলার যতটুকু অধিকার রয়েছে তা আদায় করা হলো বলে আপনি মনে করতে পারবেন। এ বিষয়ে আমি কারো অবস্থা বিচার করতে পারি না। তবে একথা আমি অবশ্যই বলবো, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আখেরাতেও কোনো পরোয়া যাদের নেই, তাদের নিজেদের ভ্রান্ত ও বিকৃত মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ বিরাট ত্যাগ স্বীকার করছে তা দেখে আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

দীন ইসলামকে কায়েম করার ব্যাপারে কর্মীদের যতখানি তৎপর হওয়া আবশ্যক, তাতে এখনো যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলে আমি অনুভব করছি। জামায়াতের কতিপয় কর্মী নিসন্দেহে পূর্ণ নিবিষ্টচিত্তে দায়িত্ব পালন করছে—যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে হৃদয় ভরে যায় এবং তাদের জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু অধিকাংশ কর্মীর মধ্যে এখনো তদ্রূপ আগ্রহ দেখা যায় না। ফাসেকী ও আল্লাহদ্রোহীতার প্রাধান্য এবং আল্লাহর দীনের (জীবন ব্যবস্থা) বর্তমান অসহায় অবস্থা দেখে একজন মুমিনের অন্তরে যে যাতনা ও ক্ষোভের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া উচিত তা খুব কম লোকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে আপনার পক্ষে অন্তত ততখানি অস্থির হওয়া উচিত, নিজের অসুস্থ সন্তানকে দেখে কিংবা ঘরে আগুন লাগার আশংকা দেখা দিলে আপনি যতখানি অস্থিরবোধ করেন। অবশ্য এ বিষয়েও একজনের কর্ম তৎপরতা ও আগ্রহ সম্পর্কে কোনো সীমা নির্দেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে প্রত্যেকের আপন বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, কতখানি কাজ করার পর তার সত্য প্রীতির দায়িত্বসমূহ সুসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা সংগত হবে। অবশ্য আপনাদের শিক্ষার জন্য সেই সমস্ত বাতিলপন্থীদের কর্মতৎপরতার প্রতি একবার লক্ষ্য করাই যথেষ্ট হবে, যারা দুনিয়ার বুকে কোনো না কোনো বাতিল মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্টপ্রহর সংগ্রাম করছে এবং সেজন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করেছে।

বিরোধিতা

এখন আমি জামায়াতের বিরুদ্ধে সম্প্রতি পরিচালিত ব্যাপক প্রচার অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। যুক্তিসংগত ও প্রমাণভিত্তিক মতদ্বৈততা—যার উদ্দেশ্য নিজে বুঝা ও অপরকে বুঝার সুযোগ দেয়া এবং মূলে সদুদ্দেশ্য ও সত্যপ্রীতি সক্রিয় রয়েছে—আমরা তা কখনো অপসন্দ করিনি, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আমরা যখন বহুবার অপরের সাথে এ ধরনের মত প্রকাশ করেছি, তখন অপরকে কেন এ অধিকার হতে আমরা বঞ্চিত করবো। কিন্তু আফসোস এই যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে এ নীতি অনুসরণকারীদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা ও অপবাদ রটনার সাহায্যে বিরোধিতা করছেন। এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের রচনাবলীকে বিকৃত করে নিজেদের ইচ্ছামত তার ব্যাখ্যা প্রচার করছেন। এই সমস্ত কাজ আমাদের অথবা জনসাধারণের কল্যাণের

জন্য নয় বরং আমাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তোলা এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তা বানচাল করাই এসবের মূল লক্ষ্য।

মিথ্যার এ ঝড়-ঝঞ্ঝার মূলে বিভিন্ন দল বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সাহায্যে পুষ্ট পত্রিকাগুলো রয়েছে, কারণ এরা এ দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলনকে নিজেদের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করে। অপরদিকে রয়েছে পাশ্চাত্যের আল্লাহদ্রোহী ও ধর্মবিরোধী মতবাদের ধারক ও বাহক গোষ্ঠী, এদের নিকট চিন্তা ও কার্যকলাপের লাগামহীন স্বাধীনতার উপর ইসলামী মত-বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের বিধি-নিষেধ অসহ্য বিবেচিত হচ্ছে। তৃতীয় দিকে রয়েছে বিভিন্ন গুমরাহ দল, তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় অত্যন্ত শংকাবোধ করছে। কারণ তারা জানে যে, এ দেশে সত্য সত্যই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে তাদের বিভ্রান্তিকর কারসাজির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের বিরুদ্ধে আর যে দলটি রয়েছে তারা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট। তারাও একথা ভালো করেই জানেন যে, তাদের পথে সত্যিই যদি কোনো কঠিন প্রতিবন্ধক থাকে তবে তা হচ্ছে একমাত্র জামায়াতে ইসলামী। এ দলগুলোর বিরোধিতাকে অনেকটা স্বাভাবিক বলা চলে। বরঞ্চ এরা যদি আমাদের বিরোধিতা না করতো, তবে তাই আশ্চর্যজনক হতো। কারণ, মিথ্যার কদর্যতা দ্বারা সত্যকে প্রলিপ্ত করায় এদের কোনো আপত্তি নেই। কাজেই এদের এ আচরণ মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু যে বিষয়ে আমাদের গোটা জামায়াত দুঃখ ও বিস্ময়বোধ করছে তা এই যে, আমাদের বিরোধী দলের মধ্যে কিছু আলেমও শামিল রয়েছেন। আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, মিথ্যা প্রচারে ও অপপ্রচারে এ মহান ব্যক্তিগণ তাদের গুমরাহ সহযোগীদেরও হার মানাচ্ছে। এ শেষোক্ত আঘাতটি বাস্তবিক আমাদের জন্য চরম বেদনাদায়ক। কিন্তু এর কারণ এই নয় যে, আমরা তাদের শক্তি সামর্থ দেখে শংকিত হয়েছি, বরং এজন্য যে, এসব 'ছাহেবানকে' দীনদার ও আল্লাহভীরু বলে মনে করতাম এবং তাদের বর্তমান চেহারা দেখতে আমরা কোনো দিন প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের মনে তো এ আশাই ছিলো যে, ইসলামী বিপ্লব সাধনের এ প্রচেষ্টায় তাঁরাই অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবেন আর আমরা শুধু তাঁদেরই পদাংক অনুসরণ করবো মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁরা কম্যুনিষ্ট, হাদীস অমান্যকারী, কাদিয়ানী এবং পাশ্চাত্যের আল্লাহদ্রোহী ও ধর্মবিরোধী মতবাদের ধারক ও

বাহকদের সাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের উপর আঘাত হেনেছে।*

হায় ! তাঁরা মুহূর্তের জন্যও যদি একথাটি ভেবে দেখতেন যে, এরূপ করার ফলে তারা কাকে ছেড়ে কাকে গ্রহণ করছেন।

যা-ই হোক, আমাদের বিরুদ্ধে যখন চারদিক হতেই আক্রমণ ও বিরোধিতা চলছে—তখন জামায়াতের কর্মীগণকে এ ব্যাপারেও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করছি।

এ প্রসংগে আমার প্রথম কথা যে, আপনারা কোনো অবস্থাতেই উত্তেজিত হবেন না। নিজেদের কথা, মেজায সকল অবস্থায়ই আয়ত্বাধীন রাখবেন। যখনই উত্তেজনামূলক অবস্থা দেখা দিবে—আপনারা এটাকে শয়তানের চক্রান্ত মনে করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য শয়তানই এরূপ চালবাযী শুরু করেছে। সে একদিকে আমাদের বিরোধী দলকে গিয়ে উস্কানি দিচ্ছে এবং তা দ্বারা আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, অপরদিকে আমাদেরকে উত্তেজিত করার জন্য চেষ্টায় রত হয়েছে, যেন আমরা উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়ি আর আমাদের এ কাজই যেন কোনো মতে সম্পন্ন না হয়, এটাই তার বাসনা। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যবস্তুটি তার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয়। কাজেই আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই তার চালে পড়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়, বিভিন্ন আলেম এবং তাদের শাগরেদ ও ভক্ত-অনুরক্তদের ব্যবহারে আপনারা যতই মনক্ষুণ্ন হোন না কেন, তা শুধু দুঃখ ক্ষোভ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবেন, এটাকে কোনো মতেই ঘৃণায় পরিণত হতে দিবেন না। কতিপয় আলেমের বাড়াবাড়ির ফলে ইতিপূর্বে একদল লোক গোটা আলেম সমাজকেই নিন্দাযোগ্য সাব্যস্ত করে গালি গালাযে রত হয়েছে। কেবল এখানেই শেষ নয়, এর পরিণতিতে মূল 'দীনি ইলম'কে পর্যন্ত নিন্দনীয় বলে প্রচার করা হয়েছে, সেরূপ ভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। আপনারা স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহর আলেমদের অধিকাংশই সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শবাদী। তাঁদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতম সহকর্মী আপনারা লাভ করেছেন এবং এ ধরনের কর্মীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এ বক্তৃতা ১৯৫১ সনে করা হয়েছিলো বিশেষভাবে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে তখন এরূপ অবস্থা ছিলো।

তৃতীয় কথা এই যে, বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করার কাজ আপনারা আমার উপরই ন্যস্ত করুন। আপনারা শুধু নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে থাকুন। প্রয়োজন অনুসারে আত্মরক্ষার দায়িত্ব আমিই পালন করবো অথবা জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের মাধ্যমে তা করানো হবে। আপনাদের কাজ শুধু এটা যে, কোনো প্রকার মিথ্যা অভিযোগ আপনাদের সামনে উত্থাপন করা হলে জামায়াতের পুস্তকাদি হতে তার জবাব অভিযোগকারীর সামনে পেশ করবেন। এরপরও যদি কেউ তর্ক করতে চায়, তবে তাকে সালাম জানিয়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করবেন। যাকে পথ চলতে হবে, তার জন্য সর্বোত্তম নীতি এটাই যে, পথের কাঁটায় পরিধানের বস্ত্র জড়িয়ে পড়লে এক মুহূর্ত সেখানে থেমে কাঁটা ছাড়াবার চেষ্টা করা। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেখানে বসে না থেকে কাপড়ের সেই অংশটুকু ছিড়ে ফেলে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে হবে।

চতুর্থ কথা এই যে, বিরোধিতা যতই অহেতুক হোক না কেন এর জবাবদানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা কখনো লংঘন করবেন না। প্রত্যেকটি শব্দ বলা কিংবা লেখার পূর্বে তা সত্যের পরিপন্থী কিনা এবং আল্লাহর দরবারে তার হিসেব পেশ করতে পারবেন কিনা তা আপনি উত্তমরূপে বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন। আপনার বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহকে ভয় করুক কিংবা না করুক আপনাকেই ভয় করে চলতে হবে।

পঞ্চম কথা এই যে, বিরোধিতার ফলে আপনাদের আন্দোলনের জন্য সাফল্য ও অগ্রগতির যে অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। আল্লাহ তাআলা এভাবে আপনার বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনারা এতে ভীত না হয়ে এ সুযোগে কাজ করে নিন। আরবে নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে যখন এ ধরনের অপপ্রচার চলছিলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ বলে খোশ খবর দিয়েছেন।

আমাদের উচিত শোকর আদায় করা, কারণ, একদিকে সরকার ক্রমাগত সার্কুলার জারী করে সরকারী কর্মচারীদের সাথে আমাদের পরিচয় লাভের মূল্যবান সুযোগ করে দিয়েছেন। অপরদিকে গুমরাহ দলগুলো নিজ মহলে আমাদেরকে পরিচিত করে তুলেছে। এছাড়া যে সমস্ত আলেম আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেছেন তাঁরাও দেশের ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন এলাকার সর্বত্র আমাদের সম্পর্কে প্রচার করছেন। এ বিপুল প্রচার আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে বিশ বছরেও সম্ভব হতো না। এখন আমাদের কাজ হলো যেসব জায়গায় আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার হয়েছে, সেখানে আমাদের সঠিক পরিচয় দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ এতে

আমাদের দ্বিগুণ লাভ হবে। যারা আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের রহস্য উপলব্ধি করতে পারবে, তাঁরা শুধু জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আস্থা-ই স্থাপন করবেন না, বরং তাঁদের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের বাহাদুরীও ধরা পড়ে যাবে। সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পর তাঁদের মনে বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাভাবটি রয়েছে, তাও বিলিন হয়ে যাবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা শয়তানের চক্রান্তকে বিশেষ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সে তাঁর অনুগামীদের হাতে এমন হাতিয়ার তুলে দেয়, যা সাময়িকভাবে বড়ই কার্যকরী মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যবহারকারীদের মূল শিরা-ই কেটে ফেলে। পরিশেষে আমি জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আলেম কর্মীগণকে বলতে চাই যে, আপনারা নিজ নিজ গোত্রের আলেমগণকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিন, তাঁদের সাথে ব্যক্তিগত কিংবা সংঘবদ্ধভাবে দেখা-সাক্ষাত ও চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করবেন। তাদেরকে আপনারা বুঝিয়ে বলুন ঃ আপনারা যা করছেন, তার পরিণাম চিন্তা করছেন কি ? ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে আপনাদের সাথে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের যে বিরোধ দেখা দিয়েছিলো তার ফলে শুধু আপনাদের নয়, বরং ইসলামের মর্যাদার উপর কঠিন আঘাত পড়েছে। এখন জামায়াতে ইসলামী আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্য থেকে একদল যোগ্যতম ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছে এবং দীনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের ফলেই তারা আপনাদের নিকটবর্তী হচ্ছে, ঠিক এ সময়ই আপনারা জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান শুরু করলেন। তাও আবার এমন ন্যক্কারজনক পন্থায় যে, আধুনিক শিক্ষিতগণ তো দূরের কথা, আপনাদের শাগরেদগণের মনেও আপনাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ সমস্ত কার্যকলাপ দ্বারা আপনাদের কি উপকারটা হবে বলে আশা করেন। একথাতো আপনারাও জানেন যে, এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন ও তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অন্তত আপনাদের কাজ নয়। এ কাজ বরং আপনাদের পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষিত লোকেরাই করতে পারেন, যারা ইসলামী আদর্শ অনুসারে নিজেদের চিন্তাধারা, কার্যকলাপ ও নৈতিক চরিত্রের সংশোধন-পুনর্গঠন করেছে। আর তারাই এখন জামায়াতে ইসলামীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদের বাদ দিয়ে এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সক্রিয় ও শক্তিশালী ইসলামী ভাবাপন্ন কোনো দলের অস্তিত্বও আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না। আর আপনাদেরও তো এরূপ ক্ষমতা নেই যে, তাদের মধ্য থেকে এমন কোনো দল আপনারা গড়ে তুলবেন। এমতাবস্থায় আপনারা জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে থাকলে এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়াবে যে, আপনারা যে কোনো ফাসেক-ফাজের ও গুমরাহ দলের নেতৃত্ব স্বচ্ছন্দে বরদাশত করতে পারেন, কিন্তু আপনাদের সহ্য হয়

না কেবলমাত্র দীনদার দলের নেতৃত্ব, সত্যিই কি আপনারা এ ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ? এবং এজন্য আল্লাহর কাছে যে জবাবদিহি করতে হবে তার পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে, তাও ভেবে দেখেছেন কি ? যদি ধরেও নেয়া যায় যে, কতিপয় ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর সাথে আপনাদের মতবিরোধ রয়েছে, তবে তা নিয়ে আন্দোলন করার উপযুক্ত সময় কি এটাই ? এসব মতবিরোধ কি সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনা কিংবা অন্য কোনো উপায়ে দূর করা সম্ভব ছিলো না ? এ বিষয়টা কি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করা, প্রচারপত্র ছড়ানো এবং পুস্তিকা প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। এতসব আয়োজন যদি সত্যিই অপরিহার্য ছিলো এবং আপনারা একান্তই দীনের উদ্দেশ্য এহেন মহৎ (?) কাজে ব্রতী হয়ে থাকেন, তবে জিজ্ঞেস করি, এ উদ্দেশ্যে কি কেউ অপরের বক্তব্যকে বিকৃত করে এবং সে যা বলেনি তাই তার উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকে ? এবং তার রচনা দ্বারা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পরও কি তা আঁকড়িয়ে থাকে ? আমাদের জামায়াতে বিভিন্ন দীনী মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত যেসব কর্মী রয়েছেন এই সকল কথা তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বুযর্গানদের থেকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলা তো দরকার। বিশেষত দেওবন্দী ও মাযাহেরী ভাইদেরকে আমি বলতে চাই যে, দেওবন্দ ও মাযাহেরুল উলুমের বুযর্গান এ নিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন যে, পাক-ভারতের সর্বত্র তাঁদের শাগরেদগণ ছড়িয়ে রয়েছেন। কাজেই তাঁরা যদি কোনো ফতোয়া কিংবা প্রচারপত্র প্রকাশ করেন, তবে সমস্ত দেওবন্দী ও মাযাহেরী শাগরেদ চোখ বন্ধ করে নিছক গুরুভক্তি ও উপদলীয় বিদ্বেষ নিয়ে চারদিক থেকে তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে জামায়াতের উপর হামলা চালাতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং তাঁদেরকে একথা বুঝিয়ে বলা আপনাদেরই কর্তব্য যে, দেওবন্দ ও মাযাহেরুল উলুম হতে আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অবশ্যই হাসিল করেছি ; কিন্তু ঈমান বিক্রি করতে শিখিনি। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার পরও যদি কেউ সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার পরিবর্তে ওস্তাদ ও পীর-পূজাই শিখলো এবং ইসলামী ভাবধারার পরিবর্তে উপদলীয় কোন্দলেই অভ্যস্ত হলো, তবে তাতে লাভ কি ?

দাওয়াতের সংক্ষিপ্ত কোর্স*

অতপর আমি আন্দোলনের প্রসারকল্পে আপনাদেরকে কয়েকটি পরামর্শ দিতে চাই। এ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অথচ

---

* এ সংক্ষিপ্ত কোর্স বর্তমান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষিপ্ত একটি পাঠ্য তালিকা রচিত হয়েছে। এর সাহায্যে আপনারা সহজে কাজ করতে পারেন। এতদিন জামায়াতের কর্মীদের একটি বিশেষ সমস্যা ছিলো যে, জামায়াতের পুস্তকাদি সংখ্যায় যথেষ্ট ছিলো না বলে সকল লোককে তা পড়ানো অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিলো। এছাড়া আর একটি অসুবিধা ছিলো যে, জামায়াতের পুস্তকাদির মধ্য থেকে কোন্ কোন্ পুস্তক অধ্যয়ন করার পর একজন লোক জামায়াতে শরীক হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে–এটা নির্ধারণ করা। কিন্তু আমাদের কয়েকটি জরুরী পুস্তক প্রকাশের ফলে এ অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে।

১. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
২. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৩. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
৪. মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী
৫. জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী
৬. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
৭. ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবী।

কেউ যদি উক্ত পুস্তিকাসমূহ অধ্যয়ন করে, তাকে জামায়াতে শামিল হওয়ার ব্যাপারে তার মর্যীর উপরেই ছেড়ে দিন।

জামায়াতে শরীক হওয়ার পর তাকে অবশ্যই জামায়াতের যাবতীয় পুস্তকাদি পাঠের পরামর্শ দিবেন। কারণ, এছাড়া তার চিন্তাধারা ও নৈতিক চরিত্র উত্তমরূপে গঠিত হবে না এবং ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যার সঠিক সমাধান কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে না। তবে জামায়াতে শরীক হওয়ার পূর্বেই সমস্ত পুস্তক পাঠ করা কারো পক্ষে জরুরী নয়।

মহিলা কর্মীদের প্রতি উপদেশ

এতক্ষণ আমি যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছি, তার অধিকাংশই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমি জামায়াতের মহিলা কর্মী এবং জামায়াত সম্পর্কে আগ্রহপরায়ণ মহিলাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে আরয করতে চাই।

সর্বপ্রথম আরয এই যে, আপনারা নিজেদের জীবনকে গড়ার জন্য দীন ইসলাম সম্পর্কে যথাসাধ্য জ্ঞান লাভের চেষ্টা করুন।

আপনারা শুধু কুরআন শরীফের অর্থ বুঝে পাঠ করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং হাদীস এবং ফিকাহ সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা অবশ্যই করবেন। আপনাদের শুধু দীন ইসলামের মূল বিষয়বস্তু এবং ঈমানের দাবী সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভই যথেষ্ট নয়, বরং আপনাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সম্পর্কে দীন ইসলাম কি কি নির্দেশ দিচ্ছে তাও আপনাদের জানতে হবে। আজ মুসলমান পরিবার-সমূহে যে শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ প্রচলিত হয়েছে এবং জাহেলী রসম-রেওয়াজ স্থান লাভ করেছে, এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে—দীন ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে মহিলাদের ব্যাপক অজ্ঞতা। তাই সর্বপ্রথম নিজেদের দুর্বলতাসমূহ দূর করাই আপনাদের প্রধান কর্তব্য।

দ্বিতীয় কাজ এই যে, দীন ইসলাম সম্পর্কে আপনি যতটুকু শিক্ষালাভ করবেন, তদনুযায়ী নিজেদের বাস্তব জীবন, নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও সাংসারিক জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। একজন মুসলমান মহিলার চরিত্র এতখানি মযবুত হওয়া দরকার যে, কোনো জিনিসকে যদি সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে তার গোটা সংসার ও পরিবার-পরিজন সকলে একযোগে বিরোধিতা করলেও যেন তার বিশ্বাস অটল থাকে। আবার যে জিনিসকে সে বাতিল বা অন্যায় বিশ্বাস করবে কারো চাপে পড়ে এটাকে সত্য বলে স্বীকার করবে না। মাতা, পিতা, স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য গুরুজন নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁদের হুকুম অবশ্যই পালন করতে হবে, তাদের সাথে অবশ্যই আদব রক্ষা করে চলতে হবে ; তাদের সাথে বেয়াদবি কিংবা উচ্ছৃংখলাপূর্ণ ব্যবহার করা চলবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকার সকলের উর্ধে। কাজেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর পথে চলতে কেউ নির্দেশ দিলে আপনারা পরিষ্কার ভাষায় তা অস্বীকার করবেন। তিনি আপনার পিতাই হোন কিংবা স্বামী—এ ব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতার প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। বরং এর পরিণাম হিসেবে এ পার্থিব জীবনের যত ভয়ঙ্কর অবস্থাই দেখা দিক না কেন, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রেখে আপনাকে তা হাসিমুখে বরদাশত করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দীনের আনুগত্যের ব্যাপারে আপনি যতখানি দৃঢ়তা প্রকাশ করবেন, ইনশাআল্লাহ আপনার পরিবেশে ততই এর শুভ প্রভাব বিস্তারিত হবে। এবং বিভ্রান্ত পরিবারগুলোর সংস্কার-সংশোধনেরও আপনি সুযোগ পাবেন। পক্ষান্তরে শরীয়াত বিরোধী রীতিনীতি এবং দাবীর সামনে আপনি যতখানি নতি স্বীকার করবেন,

ইসলামের বরকত ও কল্যাণের প্রভাব হতে আপনার সমাজ ও পরিবেশে ঈমান ও নৈতিক দুর্বলতার একটি জঘন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হবেন।

আপনার তৃতীয় কাজ এই যে, প্রচার ও সংশোধনমূলক কাজে সংসারের লোকজন, নিজের ভাই-বোন ও ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আপনাদের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত মহিলাকে সন্তান-সন্তুতি দান করেছেন তাঁদের তো ইতিমধ্যেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিয়েছেন। এখন তাঁরা যদি পাসের উপযোগী নম্বর লাভ না করেন, তবে অন্য কোনো জিনিসই তাঁদের ক্ষতিপূরণ করতে পারবে না ; কাজেই তাঁদের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে নিজেদের সন্তান-সন্ততি। এদেরকে দীন ও দীনি চরিত্র শিক্ষা দান করা তাদের কর্তব্য। বিবাহিতা মহিলাদের আর একটি কর্তব্য হচ্ছে আপন স্বামীকে সৎপথ প্রদর্শন করা, স্বামী যদি সৎপথেই চলতে থাকেন, তবে এ ব্যাপারে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য। তাছাড়া একটি বালিকা আদব-কায়দার সীমা রক্ষা করে নিজের পিতা-মাতার কাছে সত্যের কালেমা প্রচার করতে পারে এবং অন্ততপক্ষে ভালো ভালো পুস্তকাদী তাঁদেরকে পড়ার জন্য দিতে পারে। আপনাদের চতুর্থ কর্তব্য এই যে, সাংসারিক কাজ-কর্ম সম্পন্ন করার পর যতটুকু সময় আপনারা বাঁচাতে পারেন, তা অন্যান্য মহিলাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাবার কাজে ব্যয় করবেন। আপনারা ছোট ছোট বালিকা ও অশিক্ষিতা বৃদ্ধাগণকে লেখাপড়া শিখান এবং শিক্ষিতা মহিলাগণকে ইসলামী সাহিত্য পড়তে দেন। মহিলাদের জন্য নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করে তাঁদেরকে দীনি শিক্ষার সুযোগ দিন। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ বক্তৃতা করতে না পারেন তবে কোনো ভালো পুস্তকের অংশবিশেষ পাঠ করে শুনাবেন। মোটকথা যেভাবেই হোক না কেন, নিজেদের সাধ্যশক্তি অনুসারে আপনারা কাজ করবেন এবং নিজ নিজ পরিচিত এলাকার মহিলাদের মধ্য থেকে অজ্ঞতা কুসংস্কার দূর করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবেন। শিক্ষিতা মহিলাদের উপর বর্তমান আরো একটি বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এক হিসেবে এ কাজটির গুরুত্ব অন্যান্য সকল কাজের তুলনায় অনেক বেশী। তা এই যে, বর্তমান পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মহিলারা যেভাবে এ দেশের সাধারণ মহিলা সমাজকে গুমরাহী, নির্লজ্জতা এবং মানসিক ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং এ উদ্দেশ্যে তারা যেভাবে সরকারী উপায়-উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করে মুসলমান মহিলা সমাজকে ভ্রান্ত পথে টেনে নিচ্ছে—সমগ্র শক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ করা।

এ কাজটি শুধু পুরুষদের একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হতে পারে না। কারণ, পুরুষরা যখন এ গুমরাহীর প্রতিবাদ করে, তখন নারী সমাজকে এই বলে বিভ্রান্ত করা হয় যে, এরা তোমাদেরকে শুধু দাসী বানিয়ে রাখতে চায়। চিরকাল এরা এ ইচ্ছা পোষণ করে আসছে যে, নারী সমাজ চার বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ থেকে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করুক। এ আযাদীর হাওয়া যেন তাদেরকে আদৌ স্পর্শ করতে না পারে। কাজেই এ বিপদকে দূর করার জন্য মহিলা সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করা আমাদের একান্ত আবশ্যক। আল্লাহর ফযলে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতা ভদ্র ও আল্লাহভীরু মহিলাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁরা 'আপওয়া' (APWA) মার্কা বেগম সাহেবাদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, লেখা ও বক্তৃতার ব্যাপারেও কোনো অংশে পশ্চাদপদ নয়। এখন শুধু সামনে অগ্রসর হয়ে 'আপওয়া' মার্কা বেগমদের দাঁতভাংগা জবাব দেয়া তাদের কর্তব্য। তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া উচিত যে, মুসলমান মহিলা সমাজ আল্লাহ তাআলার বিধি-নিষেধের বিরোধী কোনো কাজ করতে রাযী নয়। আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত সীমালংঘন করে যে 'তরক্কী' ও 'প্রগতি' লাভ করতে হবে তার প্রতি লানত–শত ধিক্কার, একথা তাদের দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা উচিত। শুধু এটাই নয়, যেসব বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-নিষেধ লংঘন করা আবশ্যক বলে প্রচার করা হচ্ছে, ইসলামী সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে সংঘবদ্ধভাবে এর সমাধান করেও তাদের দেখানো উচিত। এরূপ কাজের ফলে বিভ্রান্তকারী পুরুষ-নারীদের মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ